ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক প্রগতি: স্বস্তি ও অস্বস্তি

সৌম্যেন্দ্র সিকদার

প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সমাজতান্ত্রিক নীতির "বিষময় প্রভাবে" ভারতের তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ এক সময়ে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ-এ পরিণত হয়েছিল। যেদিকে তাকানো যায় শুধু খাদ্যাভাব আর কর্মহীনতার হাহাকার। লালফিতের ফাঁসে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা আর শূন্যপ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার ভাঁড়ার। PL 480-র দয়ায় ক্ষুন্নিবৃত্তি আর 1966-তে টাকার বিপুল অবমূল্যায়ন, এসব নিয়ে গোটা দেশ ক্ষোভে, দুঃখে ম্রিয়মান, অপমানে অধোমুখ। 1955 থেকে 1980— এই পঁচিশ বছরে জাতীয় আয়ের (GDP) বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির হার মাত্র 3.5 শতাংশ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে বিয়োগ দিলে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিহার অতি নগণ্য। অথচ এই সময়েই দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ানের সমৃদ্ধি লাফিয়ে বেড়েছে। খরগোসের পিছনে আমরা যেন সেই গল্পের কচ্ছপ।

কিন্তু আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে কচ্ছপের গতি বাড়তে শুরু করে। একটা প্রধান কারণ হ'ল দ্রব্য রপ্তানির (merchandise export) ঊর্ধ্বগতি। যেখানে 1980-86-তে এই রপ্তানি বৃদ্ধির হার ছিল 3.7 শতাংশ, 1986-90-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় 15.5 শতাংশে। মনে রাখতে হবে এটা দ্রব্য রপ্তানির বৃদ্ধি, পরিষেবা রপ্তানিতে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা দেবে আরো পাঁচ বছর পরে এবং তখন থেকে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি প্রগতির হারও চমকপ্রদভাবে বাড়তে থাকবে। এদিকে চীন তো সত্তরের দশকের শেষ থেকেই দ্রুত উন্নতির পথে চলতে শুরু করেছে। গত দশ বছরে তাই সারা বিশ্বে হঠাৎ এশিয়ার দুই মহাশক্তির উত্থান নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। আমেরিকার গৌরব-রবি নাকি প্রায় অস্তমিত, জাপানও দীর্ঘকাল ধরাশায়ী; এবার বিশ্বশাসন করবে ভারত আর চীন। নতুন এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা কিভাবে করা যেতে পারে তা নিয়ে বছর বছর বেরচ্ছে নতুন নতুন বই এবং ইংল্যান্ড-আমেরিকায় তারা বেস্টসেলারও হচ্ছে। প্রবাসী ভারতীয়রা অবশেষে মাথা উঁচু করে, বক্ষদেশ কিঞ্চিৎ স্ফীত করে ঘোরফেরা করতে পারছেন।

ভারত ও চীনের সাম্প্রতিক সাফল্যের পিছনে মুক্ত অর্থনীতি, বিশেষত অর্গলমুক্ত বহির্বাণিজ্যের, বিশিষ্ট ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সত্য যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ

কয়েকটা মৌলিক ক্ষেত্রে সাফল্য ব্যতিরেকে বাণিজ্যে সফলতাও সম্ভব হত না। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সবুজ বিপ্লবের সুবাদে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সচেতন প্রয়াসে মূল্যবৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতির নিয়ন্ত্রণ। এছাড়া আশির দশকে আমাদের শিল্পের ভিত্তিও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠতে পেরেছিল; নানা ধরনের শিল্পদ্রব্য, যা সরাসরি ব্যবহার করা যায় অথবা যা উৎপাদনের উপাদান হিসাবে কাজে লাগে, সেগুলির নির্মাণে আমরা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলাম। সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের হারও পঞ্চাশের দশক থেকেই বাড়ছিল। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে সরকারের বৃহৎ ব্যবসা-বিরোধী নীতিতে বড় রকমের পরিবর্তন আনা হয়। অভ্যন্তরীণ বহু নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয় এবং শিল্প-সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের আমদানির পথ সুগম করে দেওয়া হয়। ব্যবসার উপর বহু কর প্রত্যাহৃত হয়। এ সবের সম্মিলিত প্রভাবে শিল্প ও বাণিজ্যের গতি বর্ধিত হয় এবং জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারও বাড়তে থাকে।

তাহলে প্রশ্ন, নব্বই-এর দশকের প্রথম ভাগে আমরা তীব্র সংকটের মুখোমুখি হলাম কেন? অনেক অর্থনীতিবিদ এর জন্য সরকারের বাজেট ঘাটতিকে দায়ী করেন। যুক্তিটা হল এইরকম: ঘাটতি পূরণ করতে সরকারকে বাজারে টাকা ধার করতে হয়। এর ফলে সুদের হার বেড়ে যায় এবং তার প্রভাবে শিল্পে ও কৃষিতে বিনিয়োগ কমে যায়। তাছাড়া, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে সরকার নাকি একটা ভীষণ ভয়ের বস্তু, তাই খরচ বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের ভূমিকা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকলে শিল্পপতিরা আতঙ্কিত হয়ে বিনিয়োগ কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সুদের হার না বাড়লেও এটা ঘটবে। কিন্তু আশির দশকের ভারতবর্ষে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সমর্থনে যথেষ্ট তথ্য নেই। সুদের হারের উপর বাজেটে ঘাটতির বিশেষ প্রভাব পড়েনি এবং আরো বড় কথা, ঐ সময় সরকারের খরচ অনেকটাই রাস্তা, বন্দর, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও টেলিকম্যুনিকেশন বা বৈদ্যুতিন সংযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে ব্যয়িত হয়েছিল। এই ধরনের খরচে প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগকারীরা ভীত হবার বদলে আনন্দিতই হয়। তথ্য বলছে, বেসরকারি বিনিয়োগ ঐ সময় বেড়েছিল বই কমেনি।

সংকটের মূল ক্ষেত্র ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যালান্স (balance of payments)। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক পতনের ফলে আমাদের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার চেয়েও বড় আঘাত হ'ল মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় যুদ্ধ, যার ফলে তেলের দাম বহুগুণ বেড়ে যায়। তেল আমাদের আমদানির খাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একই সঙ্গে ঐ অঞ্চল থেকে ভারতে পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার (remittance) পরিমাণ প্রবলভাবে হ্রাস পায় এবং আমাদের রপ্তানিও কমে যায়। বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ে টান পড়তে পড়তে এমন একটা স্তরে পৌঁছয় যেখানে আর মাত্র তিন সপ্তাহের পর সমস্ত আমদানি বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে সরকারকে IMFএর কাছে সাহায্যের হাত পাততে হয়। কিন্তু IMF বিনা শর্তে সেই টাকা দেয় না। সেইসব শর্তের মূলকথা হ'ল ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কার। ভারতবর্ষে সেই সংস্কার প্রক্রিয়ার জোরকদম সূচনা হল 1991 সালে।

আমাদের জাতীয় আয়ে অগ্রগতির প্রকার বুঝতে নিচের সারণি দু'টি সাহায্য করবে।

সারণি 1: জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ে অগ্রগতি (শতাংশ বৃদ্ধি)

	1950-60	1960-70	1970-80	1980-90	1990-2000	2000-2009
জাতীয় আয়	3.9	3.7	3.1	5.8	5.9	7.2
মাথাপিছু আয়	2.2	1.6	0.9	3.7	3.8	5.5

উৎস: সরকারের বিভিন্ন রিপোর্ট

2000-2009এর মধ্যে 2003-2009 এই পর্বে বৃদ্ধির হার ছিল 8.3 শতাংশ, চীনের সামান্যই পিছনে। এই সময় থেকেই এই দুই দেশ Asia's emerging giants হিসাবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

স্বাধীনতার আগে ছবিটা ছিল এরকম।

সারণি 2: বৃদ্ধির হার (শতাংশ)

	1860-1885	1885-1900	1900-1914	1914-1947
জাতীয় আয়	1.76	1.01	1.45	1.14
মাথাপিছু আয়	1.23	0.46	1.00	0.06

উৎস: বিভিন্ন সূত্র থেকে সংকলিত

1914-1947 এর সঙ্গে 1950-60 এর তুলনা করলে বোঝা যাবে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের অবসানের ঠিক পরের দশকেই কতটা উন্নতি সম্ভব হয়েছিল।

সেদিনের সেই শ্লথগতি কচ্ছপের ধাবমান অশ্বে রূপান্তর-ই আজ India's Growth Miracle হিসাবে অভিনন্দিত। গত দু'এক বছরে বৃদ্ধির হার 6 শতাংশে নেমে আসা দুশ্চিন্তার কারণ ঠিকই; কিন্তু ভুললে চলবে না যে দীর্ঘকাল আমরা 3 শতাংশের ফাঁদে আটকে পড়েছিলাম। এও মনে রাখতে হবে যে 2008-09-এর বিশ্ব অর্থব্যবস্থার বিপুল বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে নিতে আমাদের সময় বেশি লাগেনি এবং উন্নত দেশগুলির গড় বৃদ্ধি হার এখনও 2 শতাংশের উপরে উঠতে পারেনি।

আমাদের দারিদ্র্য কি কমেছে? সরকারি হিসাবে যথেষ্টই কমেছে, বেসরকারি সমীক্ষা ও গবেষণা বলে যে, কমলেও যথেষ্ট কমেনি। শহরাঞ্চলে যতটা কমেছে, গ্রামাঞ্চলে উন্নতি তার চেয়ে অনেকটাই কম। এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির মূল কারণ হ'ল, আমাদের সংস্কার প্রক্রিয়া শিল্প, বাণিজ্য ও বিশেষত পরিষেবার ক্ষেত্রে যতটা সফল হয়েছে কৃষিতে তার ভগ্নাংশও নয়, আর আমাদের গ্রামবাসী মানুষের অধিকাংশ জীবিকার জন্য এখনও মূলতঃ কৃষির উপরই নির্ভরশীল। চীনের শিল্পনীতি যেহেতু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত করে দিতে পেরেছে তাই সেখানে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্য এসেছে

অনেক বেশি। প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যগুলির ক্ষেত্রে চৈনিক কৃষিতে একর প্রতি উৎপাদনও ভারতের প্রায় দু'গুণ। অতএব দারিদ্র্যের প্রকোপও যে কম হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

জাতীয় আয়ে কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা এই তিনের আপেক্ষিক অবদান সাধারণভাবে উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে। উন্নতির প্রথম দিকে কৃষির গুরুত্ব থাকে সবচেয়ে বেশি, তারপর শিল্পের গুরুত্ব বাড়ার সাথে সাথে কৃষির অংশ কমতে থাকে, আর শেষ পর্যায়ে, মাথাপিছু আয় যখন বেশ উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছে, পরিষেবার গুরুত্ব বাকি দু'টিকে ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে নেয়। ভারতের ক্ষেত্রে এই তিনটি সেক্টরের মোট জাতীয় উৎপাদনে অংশ (sectoral shares in national inicome) কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে দেখা যাক।

সারণি 3: জাতীয় আয়ে শতকরা অংশ

	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2006	2009	2011
কৃষি	53	44	43	37	32	26	21	20	18
শিল্প	14	19	20	23	24	24	26	24	23
পরিষেবা	33	38	37	34	44	50	53	56	59

উৎস: সরকারের বিভিন্ন রিপোর্ট

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল এই যে, শুধুমাত্র কৃষি ও পরিষেবার গুরুত্বের দিকে তাকালে ভারতবর্ষকে উন্নত দেশের শিরোপা না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু মাথাপিছু আয়ের নিরিখে আমরা এখনও বিশ্বের পিছিয়ে থাকা দেশগুলির অন্যতম।

এই বিচিত্র পরিস্থিতির মূল কারণ হ'ল শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির বৈষম্য। কর্মসংস্থান বেড়েছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। তারও বেশির ভাগটা শহরাঞ্চলে; গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকরা আধুনিক শিল্প বা পরিষেবার উৎপাদনে অংশ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান কুড়ি শতাংশের নিচে নেমে এলেও কর্মরত জনগণের অধিকাংশ এখনও অনগ্রসর কৃষিতেই আটকে আছে। 1980-2000 এই কুড়ি বছরে কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকের শতাংশ ভারতে নেমেছে 68 থেকে 59-এ, চীনে নেমেছে 70 থেকে 48-এ। অর্থাৎ গ্রামের মানুষকে অধিকতর উপার্জনের সীমানায় টেনে আনতে আমরা তুলনামূলকভাবে ব্যর্থ হয়েছি।

গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটেনি, শিল্প ও উন্নত ITES পরিষেবা, যার রপ্তানিতে চমকপ্রদ সাফল্য আমাদের সাম্প্রতিক উন্নতির ভিত্তি, তারাও যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেখানে স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিকের ভূমিকা অতি সামান্য। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি কর্মহীন প্রগতি বা jobless growth। গ্রামের মানুষ আরো বেশি শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ হ'লে আধুনিক শিল্প ও পরিষেরা তারা আরো বেশি করে ব্যবহার করতে পারত। ঐ পথেই

দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে ও আরো আগে মহাযুদ্ধোত্তর জাপানে সর্বস্তরের মানুষ জাতীয় অগ্রগতির সুফল ভোগ করতে পেরেছিল। এদিকে আমাদের অদক্ষ, অল্পশিক্ষিত শ্রমিকরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে ভিড় বাড়িয়ে চলেছে।

সারণি 4: কর্মসংস্থানের বার্ষিক বৃদ্ধি (শতাংশ)

	সংগঠিত	অসংগঠিত
1983	2	6
1987-88	1-এর কম	3.9
1993-94	1-এর কম	1
1990-2000	0	3
2004-2005	– 2	4.8
2009-2010	1.5	4

উৎস: ভারত সরকারের বিভিন্ন রিপোর্ট

মোট শ্রমিকের শতকরা 85 ভাগ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত। বলা বাহুল্য, এই শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম, কর্মস্থলের পরিবেশ অত্যন্ত নিম্নমানের এবং চাকরির নিরাপত্তা ও অন্যান্য দীর্ঘকালীন সুযোগসুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আয় ও সম্পদের বৈষম্য ভারতে ক্রমাগত বাড়তেই থাকছে। অবশ্য বিশ্বায়নের সঙ্গে বৈষম্যবৃদ্ধির সরাসরি সম্পর্ক পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই লক্ষিত হয়েছে। নেহরু প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার যুগে বৈষম্য ব্যাপক হলেও বিভিন্ন সূচকে তার মান মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। আশির দশকের নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর গতি সেই যে ঊর্ধ্বমুখী হতে আরম্ভ করেছিল আজও তা অব্যাহত আছে। যদিও 'জওহর রোজগার যোজনা', 'মহাত্মা গান্ধী রোজগার যোজনা' ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রশ্রেণীর আয় বেশ কিছুটা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, বণ্টনে স্থায়ী উন্নতির জন্য তা যথেষ্ট নয়। স্থায়ী উন্নতি তখনই হবে যখন শিল্প ও পরিষেবার উৎপাদন কেবলমাত্র শহরকেন্দ্রিক হয়ে থাকবে না।

বৈষম্য বৃদ্ধি শুধুমাত্র সাময়িক আয় বা সম্পদেই সীমাবদ্ধ নেই, ফারাক বেড়েছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে (কারণ দারিদ্র্য বেশি কমেছে শহরাঞ্চলে) এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে। এই প্রবণতা যদি প্রতিহত করা সম্ভব না হয় তবে রাজনৈতিক ও সামাজিক অশান্তির বিস্ফোরণও রোধ করা অসম্ভব হবে।

আমাদের মুক্ত অর্থনীতির আরেকটা বড় অস্বস্তির জায়গা হ'ল বিদেশি আর্থিক পুঁজির (foreign capital) গমনাগমন। এই পুঁজি ভারতের স্টকমার্কেট বা শেয়ার বাজারে আসছে মূলতঃ চটজলদি মুনাফার খোঁজে। শেয়ারের দাম বা ভারতীয় টাকার দাম একটু কমার সম্ভাবনা দেখা দিলেই বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থারা (foreign institutional investors) তৎক্ষণাৎ

তাদের ডলার তুলে নিয়ে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করে। যেহেতু এই ডলার দিয়েই আমরা তেল ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ক্রয় করি, অতএব ডলারের যোগানে টান পড়লে তার ক্ষতিকর প্রভাব সমগ্র অর্থনীতির উপর পড়ে। দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি লগ্নির (foreign direct investment বা FDI) এই প্রবণতা থাকে না, নানাবিধ কারণে বহুজাতিক কোম্পানিরা ভারতকে এখনও তাদের ব্যবসার পক্ষে যথেষ্ট লাভজনক ক্ষেত্র মনে করে না। তার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল আমাদের দেশে বহুজাতিক সংস্থার আগমন ও সম্প্রসারণের উপর এখনও অনেক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ আছে। যেহেতু ঐ সংস্থারাই FDI-এর উৎস, আমরা FDI হিসাবে খুব বেশি ডলার পাচ্ছি না। প্রতি বছর চীন পায় আমাদের প্রায় দু'গুণ। ফলস্বরূপ, আমদানির ডলারের জন্য আমরা স্বল্পমেয়াদী, চপলমতি FPI (foreign portfolio investment) এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। স্থায়ী উন্নয়নের জন্য এখানে একটা বড় পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। সাম্প্রতিক কালের FDI এবং FPI এর চিত্র নিচের সারণিতে দেওয়া হ'ল।

সারণি 5: ভারতে বিদেশি পুঁজির পরিমাণ ($ million)

	নীট FDI	নীট FPI
2001-02	4734	1952
2002-03	3157	944
2003-04	2388	11,377
2004-05	3712	9291
2005-06	3033	12,492
2006-07	7693	6947
2007-08	15,891	27,434
2008-09	22,343	– 14,032
2009-10	17,965	32,396
2010-11	11,305	30,292
2011-12	22,006	17,171

উৎস: ভারত সরকারের Economic Survey, 2012-13.

FPI-এর ঘন ঘন উত্থানপতন লক্ষণীয়। FDI তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল।

জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সূচক হলেও তার সীমাবদ্ধতাও সুবিদিত। জীবনযাত্রার মান একটি বহুমাত্রিক বস্তু, কেবলমাত্র গড় আয়ের সাহায্যে তাকে বোঝা যায় না। নিম্নবিত্ত মানুষ যে সমস্ত অপ্রাপ্তি এবং বঞ্চনার (deprivation) শিকার হন সেগুলিকে সংখ্যায় ধরবার জন্য একাধিক সূচক উদ্ভাবিত হয়েছে। শুধুমাত্র আয়ের দারিদ্র্য গত পঁচিশ বছরে খানিকটা কমলেও (যদিও কমার পরিমাণ আশানুরূপ নয়) বহুমাত্রিক

দারিদ্র্যের নিরিখে আমাদের অবস্থান অতীব শোচনীয় হয়ে আছে। Oxford Poverty and Human Development Initiative-এর সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা বহুমাত্রিক দারিদ্রসূচকের ভিত্তিতে জানাচ্ছে যে ভারতের দরিদ্রতম আটটি রাজ্যে দরিদ্রের সংখ্যা বিয়াল্লিশ কোটিরও বেশি, যা কি না আফ্রিকার দরিদ্রতম ছাব্বিশটি দেশেও নেই। সাক্ষরতার হার আমাদের 61 শতাংশ, চীন— 91, এমনকি লেসোথো, সুদানও আমাদের থেকে এগিয়ে। পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির প্রকোপের বিচারে শুধু চীন নয়, বাংলাদেশ ও নেপালের অবস্থাও আমাদের চেয়ে ভালো। অপুষ্টি, ক্ষুধা আর শিশুমৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের শোচনীয় প্রগতির সঙ্গে জাতীয় আয়ের দর্শনীয় বৃদ্ধির কোনই সামঞ্জস্য নেই। 2000 সালে অনুন্নত দেশগুলির সামনে Millennium Development Goals-এর যে লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিল 2015-র কাছাকাছি এসে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার অনেকগুলিই আমাদের আয়ত্তের বাইরে থেকে যাবে। চীন এবং আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অনেক অনগ্রসর দেশের সাফল্য আমাদের চেয়ে অনেকটাই বেশি।

একদিকে বাড়ছে আয় ও সম্পদের বণ্টনে বৈষম্য, অন্যদিকে বিপুলসংখ্যক মানুষ বহন করে চলেছে স্বল্পাহার, অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতার বিষম ভার। এই অবস্থায় শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি কি— তা সে যত দ্রুতই হোক না কেন, পরিত্রাণের পথ দেখাতে পারবে? দ্বিধাহীন উত্তরে বলা যায়— না, না এবং না। ❑